শান্তির সংস্কৃতি: জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

মো. তৌহিদুল ইসলাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর বিশ্বের সকল দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং বিশ্বে স্থায়ী শান্তির অন্বেষায় ১৯৪৫ সালে যাত্রা শুরু করে জাতিসংঘ। এ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯৪২ সালে জাতিসংঘ (United Nations) নামটি প্রথম ব্যবহার করেন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট। বর্তমানে ১৯৩টি সদস্যদেশের প্রায় ৪১ হাজার নারী-পুরুষ এ আন্তর্জাতিক সংস্থায় কর্মরত। জাতিসংঘ চার্টার অনুসারে, এ সংস্থার মহাসচিব প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেন এবং বিশ্বের দরিদ্র ও অসহায় মানুষের পক্ষে সবসময় সোচ্চার থাকেন।

বিশ্বকে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে রক্ষা, নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণসহ সার্বজনীন মানবাধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মানুষকে রক্ষার পাশাপাশি সারাবিশ্বে শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, জাতিগত সংঘাত নিরসন, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র্যমোচন এবং মানুষের জীবনমানের উন্নয়নে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ চার্টারের মূল লক্ষ্য বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

১৯৭৪ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলায় ভাষণের মধ্য দিয়ে এ সংস্থায় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়। যদিও সেবছর ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। সেসময় বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং সকল মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের উপযোগী একটি বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য বাঙালি জাতির প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, "শান্তি এবং ন্যায়ের জন্যই জন্মলগ্ন হতে বাংলাদেশ বিশ্বের নিপীড়িত জনতার পাশে দাঁড়িয়েছে। বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল উদ্যোগের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন অব্যাহত থাকবে"। বাংলাদেশ এখনও সেই নীতিই অনুসরণ করছে।

বর্তমান সরকার জাতিসংঘের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট সময়ের আগে শেষ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা প্রস্তুত করা এবং এ বিষয়ে দরকষাকষিতে (Negotiation) বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিশ্বে "শান্তির সংস্কৃতি" প্রতিষ্ঠার প্রবক্তা বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশ এ বিষয়টিকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন ফোরামে জোরালোভাবে উপস্থাপন করে আসছে। বাংলাদেশ শান্তি, নিরাপত্তা রক্ষা এবং শান্তির সংস্কৃতি বিনির্মাণে নিয়মিত অবদান রেখে চলেছে।

করোনা মহামারি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, পারমাণবিক অস্ত্রে বিনিয়োগ আমাদের স্থায়ী শান্তি এনে দিতে পারে না। বরং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়ন আমাদের টেকসই শান্তি ও স্থিতিশীলতা এনে দিতে পারে। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে তাঁর ভাষণে পারমাণবিক যুদ্ধের হুমকিমুক্ত পৃথিবী গড়ার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছিলেন। সে অবধি পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্বগড়ার বিষয়ে বাংলাদেশ সবসময় তার দৃঢ় অবস্থান তুলে ধরেছে। পরমাণু প্রযুক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশসমূহের কার্যক্রমকে বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। মহামারিকালে অসহিষ্ণুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শান্তির সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবিষয়গুলো মোকাবিলা করা সম্ভব।

২০০৬ সালে জাতিসংঘ গৃহীত 'বৈশ্বিক সন্ত্রাস দমন কৌশল'কে বর্তমান সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 'সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০১২' এবং 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০৯' প্রণয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী সব আন্তর্জাতিক পদক্ষেপের সাথে যুক্ত। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদের বিপক্ষে বাংলাদেশের 'জিরো টলারেন্স নীতি' আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণে বাংলাদেশের অবস্থান এখন শীর্ষে। সংঘাতপ্রবণ দেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও শান্তি বজায় রাখতে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন।

মহামারি করোনা ভাইরাসের টিকা এ ভাইরাসের ভয়ঙ্কর থাবা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। টিকা আবিষ্কৃত হলে তা বৈশ্বিক সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে কোনো রকম বৈষম্য ছাড়া বিশ্বের সকল মানুষের পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ অত্যন্ত সোচ্চার। সবদেশ যেন সময়মতো এবং একইসঙ্গে টীকা পেতে পারে সে বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে তাঁর ভাষণে তুলে ধরেছেন ।এক্ষেত্রে কারিগরি জ্ঞান ও মেধাস্বত্ব প্রদান করা হলে বাংলাদেশেই উৎপাদিত হতে পারে এ মহামূল্যবান টীকা।

শুধুমাত্র শান্তি এবং আন্তর্জাতিক সংহতির পরিবেশেই বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সমাধান করা সম্ভব। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ শান্তি ও জনগণের বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় কখনও কখনও ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘদিনে জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনের নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত ও বৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না ই। মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে নির্যাতন, নিপীড়ন, হত্যাসহ জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার পরও ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনসহ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় এখন পর্যন্ত জাতিসংঘের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরো সক্রিয় ভূমিকা প্রয়োজন।

অভিবাসী শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সবসময় জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালে ভূমিকা রাখছে। প্রবাসী শ্রমিকরা স্বাগতিক দেশ ও নিজ দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখে চলেছেন। বর্তমান মহামারি পরিস্থিতিতে অনেক শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছে । এ অবস্থায় অভিবাসী শ্রমিকদের বিষয়টি স্বাগতিক দেশ যেন মানবিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করে সে বিষয়ে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সক্রিয় ভূমিকা আবশ্যক।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের সমস্যাগুলো ক্রমান্বয়ে প্রকট হচ্ছে। করোনা মহামারির মধ্যেও বন্যা, ঘূর্ণিঝড়ের মতো সমস্যা মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহ অত্যন্ত ঝুঁকিপুর্ণ । জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বৈশ্বিক এবং এ সমস্যার সমাধান বৈশ্বিক উদ্যোগের মাধ্যমেই করতে হবে। এ সমস্যা হতে উত্তরণে একটি টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ সবসময় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। এ সমস্যা মোকাবিলায় গঠিত সংস্থা Climate Vulnerable Forum (CVF) ও V-20 Group of Ministers of Finance- এর বর্তমান সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে।

করোনা পরবর্তীকালে বিশ্বের সকল দেশ আরো বেশি ঐক্যবদ্ধ হবে এবং সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হবে। আর্থসামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি বিশ্বে শান্তির সংস্কৃতি এবং একটি মানবিক পৃথিবী প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ আরো সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে- জাতিসংঘ দিবসে এটাই বিশ্বের সকল মানুষের প্রত্যাশা।

#

১২.১০.২০২০ পিআইডি ফিচার